সাঁওতাল সমাজের দেব দেবী

চরণ মাণ্ডি

"জহার গঁশাই মারাং বুরু..." সাঁওতাল সমাজে যে কোন পূজানুষ্ঠানে উচ্চারিত প্রথম উক্তি বা মন্ত্র। তারপরেই উচ্চারিত হয় উপলক্ষ এবং পরে পরে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে তাঁর করুনা চেয়ে কিছু নিবেদন করা এবং তিনি যেন তা গ্রহণ করে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। এর ভাষা যেমন সহজ সরল তেমনি প্রত্যক্ষ, সরাসরি। "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"র মতই চেয়ে নেওয়া। তবে দেবতাকে স্মরণ করে এভাবে প্রার্থনা নিবেদনের ভাষা এবং পদ্ধতি সাঁওতাল সমাজে কবে থেকে অর্থাৎ কোন সময় কাল থেকে প্রচলিত সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা আমার পক্ষে মুসকিল। আর দৈব আরাধনার সূচনাকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কতটা অবিকৃত এবং কতখানি রূপান্তরিত সে বিষয়ে আলোকপাত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার উপর সাঁওতাল সমাজে দৈব আরাধনার প্রকার পদ্ধতি উপকরণ ইত্যাদি তাদের নিজস্ব উদ্ভাবনী সঞ্জাত না অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত বলা মুসকিল।

এবার আসি সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত দেব-দেবীদের কথায়। তার আগে দুচার কথা বলে নিতে চাই। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক ভাবনা-ধারণায় দুটি ধারা – সাকার এবং নিরাকার পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলে আসছে। এই দুই ধারার মধ্যে নিরাকার ধারাটি যে সাকার ধারণার বহুপূর্বে সমাজে প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিরাকার ধারাটি বর্তমান যাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সাঁওতাল জনগোষ্ঠী তাদের মধ্যে অন্যতম। আর পাঁচটি জনগোষ্ঠীর মতই ধর্মীয় ভাবাবেগে মূর্তিপূজার গুরুত্ব ও তাৎপর্য আজও তাদের আধ্যাত্মিক চেতনায় নাড়া দিতে পারেনি। এমন কি সারা দেশ যখন মঠ, মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় ভরে গেল এবং দেবতা স্থলের নানান প্রতিকৃতিতে পরিপূরিত হয়ে সাকার ধারণার নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করল, তখনও কিন্তু এই সমাজের মধ্যে দেবালয় বা মন্দিরের প্রয়োজন বিন্দুমাত্র অনুভূত হয়নি। কেন দেবালয় নয় তাদের ধারণাটি রবি ঠাকুরের ভাষায় বলি, "আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান অনন্তনীলিমা মাঝে, ..."

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যার সৃষ্টি, তাঁর জন্যে গৃহ (মন্দির) নির্মাণের স্পর্ধা এ পর্যন্ত সাঁওতাল সমাজ দেখাতে পারেনি। তাদের বিশ্বাসের ধারণাটি মাঝি রামদাস টুডুর ভাষাতে বলি —

"আজম পে হো দিশম হড়কো,
সের্যারে মেনায় তাবনা হো,
বাবা ঈশ্বর চান্দো বঙ্গা উনি বাড়ে
বতরায় পে হো।
উনি বাড়ে লাজাও আয় পে হো,
উনি বাড়ে পাতিয়াও আয় পে হো,
উনি গে দ মেনায় তাবনা হো
দাঃ ভিতিরিরে দাঃ তালারে হো।

ঞুত রে হঁ মেনায় গেয়ায় ঞে ঞেল কান গেয়ায় —
নওয়া কাথা দ পাতিয়াও পে হো
নওয়া কাথা দ সাবিয়াঃ পে হো।"

অর্থাৎ – "শোন হে দেশ বাসী, স্বর্গে তিনি আছেন, বাবা ঈশ্বর চান্দ বঙ্গা তাঁকে তোমরা সমীহ কর। তাকে লজ্জা কর, বিশ্বাস কর, তিনি আছেন আমাদের মধ্যে, জলের মাঝে, জলের ভেতরে (অর্থাৎ অনু পরমানুতে), অন্ধকারে থেকেও তিনি আমাদের দেখছেন। একথা তোমরা বিশ্বাস কর, একথা সত্য বলে জেনে রাখ।" অনাদিকাল ধরেই এই বিশ্বাস, এই সত্য ধারণা। শত বিবর্তন, শত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও এই ধর্মীয় চেতনা সাঁওতাল সমাজে জীবন সত্য হয়ে স্বমহিমায় বিরাজমান।

সাঁওতালরা মনে করে বঙ্গা বা ঈশ্বরময় এই জগৎ। জীব-জড়, দৃশ্য-অদৃশ্য, আলো-অন্ধকারের প্রতিটি বস্তুকণার মধ্যে তাঁর অবস্থান। অপরিমেয় তাঁর ক্ষমতা, অতুলনীয় তাঁর কীর্তি। সকলের বিশ্বাস তিনি অসীম অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তাই যে কোন বিপর্যয়ে রক্ষা পেতে, যে কোন কাজে জীবন-জীবিকার প্রশ্নে জন্ম মৃত্যুর প্রশ্নে, রোগ-শোকের প্রশ্নে, সফলতা পেতে সেই প্রাচীনকাল থেকে গাছ-পাথর ইত্যাদির মধ্যে ঈশ্বরের কল্পনা করে প্রতীকী রূপে পূজা করে আসছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক মহাশয়ের কথা স্মরণ করতে পারি। "আরণ্যক দর্শন ও সাঁওতালি ঈশোপনিষদ" গ্রন্থে তিনি বলেছেন — "শক্তিকে আরাধনা করিতে হইলে প্রয়োজন হয় মাধ্যম বা মিডিয়ামের। সাধারণত পাথরের নুড়ি কিংবা কলশিতে জল ভরিয়া তাহার মাধ্যমে আত্মাশক্তি বা বঙ্গাকে আরাধনা করাই বিধান।" এবার সাঁওতাল সমাজে আরাধ্য দেবদেবীর কথায় আসি।

বিশিষ্ট ভাষাবিদ পণ্ডিত শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে মহাশয়, "হড় সমাজরে বঙ্গাবুরুকো" গ্রন্থে সাঁওতালদের আরাধ্য দেব দেবীদের কথা তত্ত্ব এবং তথ্য ভিত্তিক অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন। আমি সে আলোচনায় না গিয়ে – আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, বর্তমান সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত এবং পূজিত দেব দেবীদের কথা অতি সাধারণভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

সাঁওতাল সমাজে যে সমস্ত দেবদেবীর আরাধনা করা হয় — ডঃ সুহৃদবাবুর ভাষাতেই বলি, "আদিবাসী জীবনকে যে ধর্মীয় ধারণা আচ্ছন্ন করিয়া আছে তাহা হইল বঙ্গার ধারণা। বঙ্গাশব্দের অর্থ হইল অশরীরী শক্তি যাহা তাহাদের প্রতি মুহূর্তে প্রভাবিত করিতেছে। ...সাঁওতাল মুণ্ডাদের মতে বঙ্গাহীন স্থান নাই বলিলেই চলে। বঙ্গা সর্বত্র বিরাজিত। ... পথের যে বঙ্গা তাহার নাম 'ডাহার বঙ্গা' বা পথ দেবতা। বাড়ীর যে বঙ্গা তাহার নাম 'অড়াঃ বঙ্গা' অর্থাৎ গৃহ দেবতা। শস্যের যে দেবতা তাহার নাম 'শ শ বঙ্গা' বা শস্য দেবতা'। তিনি আদিবাসীদের বঙ্গা বা দেবতা সম্পর্কে বলেছেন "... দেবতা ও অপদেবতা দুই অর্থেই বঙ্গার ধারণা।" যিনি সমাজ সংসারের দুঃখ হরণকারী, সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনকারী। বিপদ আপদ থেকে রক্ষাকারী, সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কারী তিনি এক অর্থে যেমন বঙ্গা অর্থাৎ দেবতা, অপর পক্ষে ঠিক তার বিপরীত অর্থে ও বঙ্গা থাকে অপদেবতা বলা হয়। যার কু-দৃষ্টিতে যতরকমের অনাচার, দুর্যোগ দুর্বিপাক যাবতীয় দুঃখ কষ্ট সংগঠিত হয়।

সাঁওতাল সমাজে দেব দেবীর প্রধান আরাধনার স্থান হল 'জাহের থান'। অঞ্চল ভেদে 'সারনা থান', 'গড়াম থান' বলেও পরিচিত। প্রতিটি গ্রামে একটির বেশী দুটি জাহের থান

দেখা যায় না। আবার জাহের থানগুলোর অবস্থান লোকালয়ের মধ্যে নয়। লোকালয় থেকে সমান্য দূরে, গুটিকতক শাল ও মহুয়া গাছে ঘেরা ছোট্ট এক ফালি জায়গা। 'জাহের থান'গুলো গড়ে ওঠার বহু কাহিনী সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত, কেউ কেউ মনে করেন- সাঁওতালদের পূর্বপুরুষরা জঙ্গল কেটে আবাদ জমি তৈরী করার সময় দু চারটে শাল মহুয়ার গাছ দেবতাদের উদ্দেশ্যে রেখে দিয়ে ছিল। কৃষি নির্ভর জনজীবনে দেবতার অনুগ্রহ একান্ত ভাবে দরকার, সময়ে বৃষ্টি এবং বন্য প্রাণীদের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা একমাত্র দেবতাদের পক্ষেই সম্ভব – এভাবে কল্পনা করে জাহের থান স্থাপন করা অসম্ভব নয়। এই ভাবনার সমর্থনে আর একটি কথা বলা যেতে পারে। জাহের শব্দটি 'জ এ্যর' কিংবা 'জ ইর' (অর্থাৎ বীজ বপন এবং ফসল কর্তন) থেকে আসাটা অসম্ভব নয়। এছাড়া কেউ কেউ মনে করেন নিজস্ব এলাকা বা গ্রামের সীমা নির্ধারণের সাক্ষী হিসাবে রেখে দিয়েছিল। আবার কেউ মনে করেন আবাদী মাঠের মাঝে গরমের সময় ছায়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে দু'চারটে করে শালগাছ ঐভাবে রেখে দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, জাহের থানের সৃষ্টির ইতিহাস যাই হোক না কেন বর্তমানে দৈব আরাধনার পবিত্র স্থান হিসেবে চিহ্নিত।

সাঁওতাল সমাজে যে সমস্ত দেব-দেবীর আরাধনা করা হয় তাদের দু ভাগে ভাগ করতে পারি। (১) সার্বজনীন, (২) ব্যক্তিগত। জাহের থানে মূলত সার্বজনীন পূজানুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হয়। যেমন সিঞ বঙ্গা, জমসিম বঙ্গা, মারাংবুরু, জাহের এ্যরা, মড়েক তুরুইক, গঁসায় এ্যরা, পারগানা বঙ্গা ইত্যাদি। জাহের থান ছাড়াও অন্যস্থানে অনেক পূজার আয়োজন করা হয়। সেগুলির কিছু কিছু যেমন সার্বজনীন তেমনি ব্যক্তিগতও বটে। সার্বজনীন হিসেবে বলা যেতে পারে বাহা এঁদে, দাসায়, সহরায় পূজানুষ্ঠান। আবার ব্যক্তিগত পূজানুষ্ঠান, পাতা, কারাম, গমাঃ এরঃসিম ইত্যাদি। এছাড়াও বেশ কিছু পূজানুষ্ঠান আছে যেগুলি নিছক ব্যক্তিগত। যাকে বলা যায় বংশগত, বংশ পরম্পরায় তার পূজানুষ্ঠান করে থাকে। বংশের লোক ছাড়া অন্যকারো এ পূজার অধিকার থাকে না। এছাড়াও আছে অপদেবতা যেমন বাঘুত বঙ্গা, রঙ্গরুজি বঙ্গা, নাইহার বঙ্গা, কিসাঁড় বঙ্গা ইত্যাদি।

সাঁওতালি মতে বছরের শুরু মাঘ মাসে, এবং শেষ পৌষ মাসে। বছরের সূচনা করা হয় 'মাঘ সিম জম' পূজানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। আর শেষ হয় পৌষ পার্বন বা মকর সংক্রান্তি দিয়ে। সাঁওতালিতে বলে সাকরাত পরব। এখানে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো, বর্তমানে যদিও 'মাঘ সিম' পূজা দিয়ে বছরের সূচনা, পূর্বে কিন্তু কেবল 'সিঞ বঙ্গার' পুজো দিয়ে বছরের সূচনা হত। তখন 'মাঘসিমের' কোন পূজা হত না। 'সিঞ বঙ্গা' অর্থাৎ সূর্য দেবতার পূজাই অনুষ্ঠিত হত। অনেক পরে 'মাঘ সিম' পূজার প্রচলন। বর্তমানে সিঞ বঙ্গার পূজা খুব একটা দেখা যায় না। 'মাঘ সিমের' পূজাই অনুষ্ঠিত হয়।

'মাঘ সিম' পূজা গ্রামের জাহের থানে অনুষ্ঠিত হয়। জাহের থানে আলাদা আলাদা বেদী নির্মাণ করে একে একে প্রথমে মারাং বুরু, তারপর জাহের এরা, তারপর মড়েক-তুরুইক পর পর পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজোর আয়োজক এবং পরিচালক নায়কে। তিনি পুরোহিত। সমাজে মাঝি হাড়ামের পরেই এর স্থান। জম সিম এর পূজানুষ্ঠান অঞ্চল ভেদে কম বেশী পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পার্থক্য যাই থাক মোট কথা সবাই যাতে সুখে থাকে বছরটা যাতে ভালোভাবে কাটে তার প্রার্থনা জানিয়ে মোরগ উৎসর্গ করা হয়। এই পুজোর পরেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া হয়। গ্রামের পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচন করা

কাজের লোক (রাখাল, নাগাড়, কিষান ইত্যাদি) ঠিক করা এবং মূল্য নির্ধারণ করা, কারো কোন পাওনা গণ্ডা থাকলে তা মিটিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এই পূজা না করে বনে প্রবেশ করা নিষেধ, চাষের কাজেও হাত দেওয়া যাবে না। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে সাধারণত এই পূজা হয়ে থাকে।

মাঘ সিমের পর উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান 'বাহা-পরব'। বাহা পূজা সাধারণত ফাল্গুন মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতালদের কোন পূজানুষ্ঠানে সাধারণত ফুলের ব্যবহার দেখা যায় না, কেবল বাহা পুজোতে শাল ও মহুয়া ফুল ব্যবহার করা হয়। বাহা পূজার গুরুত্ব হচ্ছে – এ পূজা না করে নতুন কিছু বিশেষ করে ফুল, ফল, পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। এই পূজার পরেই শুরু হয় বিবাহ সংক্রান্ত ছেলে মেয়ে দেখার কাজ।

চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয় 'পাতা' পরব। এটি ব্যক্তিগত পূজানুষ্ঠান। রোগ-ব্যধি, কঠিন অসুখ-বিসুখ থেকে মুক্তি পেতে এই পূজার আয়োজন।

বৈশাখের শুক্লা পঞ্চমীতে মাঃমড়ে পূজা। জাহের থানে এই পূজার আয়োজন করা হয়। কৃষি কর্মে যাতে ব্যঘাত না ঘটে এবং চাষবাস যাতে ভালোভাবে হয় তার জন্য আবেদন জানানো হয়।

এরপরে পরে আছে 'এরঃসিম', গমাঃ, এঁদে। তারপরে দাসাঁয় এবং সহরায়। এছাড়া নানান অপদেবতার পুজো, শিকার অনুষ্ঠানের পুজো, কারাম পুজো।